শিক্ষার প্রসার ॥ এ দায় সকলের

এমনিতে তো শিক্ষার প্রসঙ্গ উঠলেই হতাশার ছড়াছড়ি—হচ্ছে না, কিছুই হচ্ছে না। শিক্ষার প্রসার ঘটানো প্রয়োজন, আপ্রাণ প্রয়াসেও তেমন অগ্রগতি কিছু ঘটছে না; সময়ের দাবি, শিক্ষার গুণগত মান বাড়াতে হবে, মান বজায় রাখার চেষ্টাতেই প্রাণান্ত। এমনি করে যা কিছুই কাম্য, মনে হয় সবই যেন আমাদের নাগালের বাইরে। শিক্ষা প্রসঙ্গে এই আমাদের মর্মান্তিক বাস্তবতা।

এই পরিবেশে যদি দেখা যায়, কিছু প্রতিষ্ঠান পুরস্কার পাচ্ছে; কিছু শিক্ষক সম্মানিত হচ্ছেন; মর্যাদা পাচ্ছেন কিছু-সংখ্যক শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব—আমরা উচ্ছ্বাসিত হই হতাশা কাটানোর অবলম্বন পেয়ে। ভাবতে ইচ্ছে করে, কোথাও যখন কিছু কাজ, কিছু সন্তোষ জমা পড়তে পারছে, একে আরেকটু বাড়িয়ে নিয়ে স্বস্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হয়ত অসম্ভব হবে না।

শিক্ষা সপ্তাহের পুরস্কার বিতরণী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই আনন্দ আর আশাবাদকেই ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। কৃতী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানানোর অবকাশে সকলের প্রতি সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন। সহযোগিতা শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে। তাঁর আশা, সকলের সহযোগিতায় জনগণকে শিক্ষিত এবং দেশকে স্বনির্ভর করে তোলা সম্ভব। সম্ভব বিশ্বের বুকে আবার মর্যাদার শির উঁচু করে তুলে ধরা। তবে, প্রয়োজন দলমত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতার।

শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনটা যেমন, তেমনি কিংবা হয়ত তারচে বেশী তাৎপর্যবহ এই 'সকলের সহযোগিতা'। বিষয়টা সহজবোধ্য করার জন্যে এটুকু উল্লেখই যথেষ্ট যে, সকলের সহযোগিতা ছাড়া যাবতীয় সমস্যার অন্তরায় কাটিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভব হওয়ার হলে আমাদের অর্জন গত তিন বছরেই পূর্ণতায় পৌঁছাতো। কেননা, এ সময়ে শিক্ষার প্রসার প্রশ্নে সুদূর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, সিদ্ধান্তকে বাস্তবে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সরকারী সমর্থন নিয়ে যাওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ পর্যায়ে, নতুন সুযোগ আর আকর্ষণ ছড়ানো হয়েছে চারপাশে। একই সঙ্গে, শিক্ষার প্রয়োজন সংক্রান্ত ধারণারও বিস্তার ঘটানো হয়েছে। ফল কিন্তু এখনো নগণ্য। সেশনজট এখনো জাঁকিয়ে আছে, সন্ত্রাসও ফাঁক পেলেই মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। মধ্যপথে বিদ্যালয় ত্যাগের বেদনায় প্রাথমিক শিক্ষাও প্রায় সমানভাবেই মুহ্যমান।

এই হতাশ-চিত্রের মূলে আছে একটাই ঘটনা। সরকার তার ভূমিকায় পরিবর্তন আনলেও অন্যত্র তার তেমন প্রভাব পড়েনি। অর্থাৎ শিক্ষার পক্ষে সম্মিলিত উদ্যোগ আজো তেমন দানা বেঁধে ওঠেনি। এই না পারার জন্যেই হতাশা। হতাশা কাটানোর জন্যেই সহযোগিতার ডাক।

গোড়াতেই বলে রাখা দরকার সকলের প্রতি সহযোগিতার এ ডাকের উৎসও কিন্তু সকলের মিলিত স্বার্থ। বিশ্ব আজ দ্রুতগতিতে নতুন শতাব্দীর দিকে ধাবমান। শতাব্দী-কালের কল্পিত সীমা হলেও নয়া শতাব্দী নতুন জীবনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসছে। এ নিয়ে আজ কারো মনেই দ্বিধা নেই। এই নতুন জীবন উন্নত প্রযুক্তি আর তীব্র প্রতিযোগিতার জীবন। প্রযুক্তি আর প্রতিযোগিতার ক্ষমতা সবই শিক্ষার মানের উপর নির্ভর। টিকে থাকতে হলেও তাই শিক্ষার মানোন্নয়নে মন দিতে হবে।

এ উপলব্ধি উন্নত বিশ্বেও নয়া প্রতিযোগিতার জন্ম দিয়েছে। এ প্রতিযোগিতা শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর প্রতিযোগিতা—শিক্ষাকে সময়োপযোগী করে তোলার প্রতিযোগিতা। কত কম সময়ে এ লক্ষ্য অর্জন করা যাবে, তারই উপর তারা নিজেদের অস্তিত্বের মাত্রা বিবেচনা করছেন। সে ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থানটা কোথায়?

কম কথায় আমাদের অবস্থান হচ্ছে এই, মানোন্নয়ন তো পরের কথা, সাবেকী শিক্ষার ধারাটাও সর্বত্র বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা আমাদের জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশকে শিক্ষার আওতায় আনতে পারিনি। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণের পরও সব শিশুকে বিদ্যালয়ে নিতে পারছি না কিংবা যাদের নিচ্ছি তাদেরও একটা নির্ধারিত শিক্ষাসূচী পর্যন্ত ধরে রাখতে পারছি না, এ অবশ্যই বড় ব্যর্থতা। কিন্তু এরচে বড় ব্যর্থতা হচ্ছে, যাদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে পারছি, তাদের জন্যে নতুন যুগের উপযুক্ত শিক্ষার চিন্তা করা তো পরের কথা, চালু শিক্ষাক্রমই নিয়মিত রাখতে পারছি না। নানা কারণেই ছেদ পড়ছে। ব্যাঘাত আসছে। আর সব মিলে দু'বছরের শিক্ষার সনদ পাঁচ-সাত বছর পর মিললেও এর মান নিয়ে ভরসা করা যাচ্ছে না। সোজা কথায় বলতে গেলে, শিক্ষাও তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে বসেছে। এমন একটা অবস্থায় নতুন শতাব্দীর কিংবা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির মোকাবিলার চেয়ে অস্তিত্ব রক্ষার চিন্তাই বড় হয়ে ওঠার কথা। আমাদের মূল দুর্ভাবনাও তাই।

এমন একটা অবস্থায় আর সবাই ভুল করলেও সরকারের পক্ষে ভুল করার উপায় থাকে না। সরকারকে সবকিছু একটা সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখতে হয়, উপস্থিত মুহূর্তের চেয়ে অনেক সময় ভবিষ্যতের বিবেচনাকে দিতে হয় প্রাধান্য। সম্ভাবনা আর আশংকার ছবি এভাবেই সরকারের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বেগম খালেদা জিয়া ও তাঁর সরকারের শিক্ষা-ভাবনার দিকে চোখ ফেরালে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তারা সমস্যাটিকে আন্তরিকভাবে বোঝার চেষ্টা করেছেন। কতিপয় স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। সিদ্ধান্ত কার্যকর করার চেষ্টায়ও কার্পণ্য নেই। কাম্য সাফল্য তবু আসছে না। এই না আসার কারণ একটাই—সকল মহলের সহযোগিতার অনুপস্থিতি। সহযোগিতার আহ্বান এ জন্যেই এত জরুরী।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শিক্ষা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশে আমরা কিন্তু কেউই কম যাই না। তবে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এই উদ্বেগ প্রকাশে এক ধরনের কপটতাই প্রচ্ছন্ন থাকে। শিক্ষার সমস্যাকে অটুট রেখে তার সমাধানের দাবি উঠিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল যতটা কাম্য, শিক্ষাঙ্গনকে পরিচ্ছন্ন করে তোলা ততটা নয়। পরিচ্ছন্ন হলেই বরং আমাদের অনেকের ভয়।

সমাজের বিভিন্ন স্তরে জাঁকিয়ে বসা কায়েমী স্বার্থ শিক্ষার বিকাশে আগ্রহী নয়। দুঃখের সঙ্গে হলেও স্বীকার করতে হয়, রাজনৈতিক মহলের উদ্দেশ্যকেও পরিপূর্ণ সন্দেহমুক্ত মনে করা যায় না। শিক্ষক সমাজের একাংশে অবক্ষয়ের ভয় চরমে পৌঁছেছে। শিক্ষাদানের চেয়ে শিক্ষক রাজনীতির ফায়দা কুড়ানোতেই তাদের আগ্রহ বেশী। সঙ্গত কারণেই শিক্ষার্থী সমাজের বড় অংশ শিক্ষাবিমুখ। এই হতাশ অবস্থায় যদি অভিনন্দিত করার কিছু উপলক্ষ খুঁজে পাওয়া যায়, এরচেয়ে বড় আনন্দের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। শিক্ষা সপ্তাহের পুরস্কার বিতরণী তেমনি এক আনন্দ উপলক্ষ। এমন এক পবিত্র মুহূর্তের উচ্চারণে আর যাই হোক আন্তরিকতার অভাব ঘটতে পারে না। এই আন্তরিকতা যদি আমাদের স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয়, সামনের অন্ধকারই কেবল গাঢ়তর হবে। আলোক যদি কাম্য হয়, শিক্ষার শিখাকেই জাগিয়ে তুলতে হবে। এর যেমন বিকল্প নেই, তেমনি বিকল্প নেই সম্মিলিত সাধনার।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উদাহরণ দিয়েও ব্যাপারটা ব্যাখা করা যায়। সরকার দু'বছর আগে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করেছেন। যার সহজ অর্থ হচ্ছে ছ'থেকে দশ বছর বয়েসী প্রতিটি শিশুকেই বিদ্যালয়ে যেতে হবে। অর্থ যাই হোক আমাদের প্রত্যাশা কিন্তু অনেক কম। আমাদের আশা ছিল পঁচানব্বই সন নাগাদ বিরাশি শতাংশ শিশুকে বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া।

সরকার এ লক্ষ্য পূরণের জন্যে 'শিক্ষার জন্যে খাদ্য' প্রভৃতি কর্মসূচীও হাতে নিয়েছেন। তা সত্ত্বেও এখনই আশংকা করা হচ্ছে, পঁচানব্বইর লক্ষ্য পূরণ হতে আরো সময় লাগবে। আমরা মনে করি সকল মহলের সক্রিয় সহযোগিতা থাকলে এমন একটি ছোট ব্যাপার নিয়ে সংশয়ের কারণ ঘটতো না। তেমনি প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার বিকাশ উপরমুখী চাপ তৈরি করে উচ্চতর স্তরের অনেক সংকট মোচনে সহায়ক হতে পারতো। শিক্ষা পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকতা ফিরে এলে সম্ভব ছিল গুণগত উন্নয়নে মন দেয়া।

এ কাজগুলো কারো একার পক্ষে সাধিত হওয়ার নয় বলেই সহযোগিতার ডাক। আর সহযোগিতার জন্যে শিক্ষার চেয়ে প্রশস্ততর ক্ষেত্র আর কিছুই হতে পারে না। দায়টা সকলের। ফলে সকলের সহযোগিতা আসতে বাধ্য। অপরিহার্যকে দূরে ঠেলার অর্থ হবে দুর্ভাগ্যের লালন। এমন দুর্মতি ঠাঁই পাবে না বলেই আমরা আশা করি।

—সালেহ চৌধুরী

দৈনিক বাংলা